বাংলাদেশে বিদ্যমান শারীরিক শাস্তি সংক্রান্ত আইনসমূহ বিলুপ্তকরণ ও সংশোধন বিষয়ে আইন কমিশনের সুপারিশ

শারীরিক শাস্তি প্রদান একটি নৃশংস, অমানবিক এবং অপমানজনক পদ্ধতি। কিন্তু বাংলাদেশে কিছু আইন রয়েছে যেখানে শারীরিক শাস্তির বিধান রয়েছে। সেই সব আইনসমূহ বাতিল বা সংশোধন করার জন্য সুপারিশ করার উদ্দেশ্যে আইন কমিশন বর্তমান গবেষণাটি পরিচালনা করেছে। এই গবেষণাটি পরিচালনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট) আইন কমিশনকে সহযোগিতা করেছে। এ কারণে আইন কমিশন ব্লাস্ট এর প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছে।

বাংলাদেশসহ পৃথিবীর কিছু কিছু রাষ্ট্রে এখনো শারীরিক শাস্তির বিধান রয়েছে, যদিও পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেই শারীরিক শাস্তি বিলুপ্ত করা হয়েছে। নভেম্বর ২০০৯ পর্যন্ত পৃথিবীর ৮৩ টি দেশে চাবুক মারা, বেত দ্বারা পেটানো এবং অন্যান্য শারীরিক ও মানসিক শাস্তি বাতিল ঘোষণা করা হয়েছে যার মধ্যে প্রাক্তন বৃটিশ উপনিবেশসহ অনেক উন্নয়নশীল দেশ যেমন: কম্বোডিয়া, চিলি, জর্ডান, কেনিয়া, নামিবিয়া, থাইল্যান্ড ইত্যাদি রয়েছে। ১৯৯৫ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার সাংবিধানিক আদালত আইনগত শারীরিক শাস্তিকে নিষ্ঠুর, অমানবিক ও মর্যাদাহানিকর হিসাবে আখ্যায়িত করেছে। আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে ১৯৫৫ সালেই চাবুক আইন বিলুপ্ত করা হয়। ভারতে শুধুমাত্র কারা আইনে চাবুক দ্বারা শাস্তি প্রদানের বিধান রয়েছে। অপরদিকে বাংলাদেশে বেশ কিছু আইনে এখনো শারীরিক শাস্তির বিধান রয়েছে। সেগুলো হলোঃ

১। চাবুক আইন, ১৯০৯ *(The Whipping Act, 1909)*

২। রেলওয়ে আইন, ১৮৯০ *(The Railways Act, 1890)*

৩। সেনানিবাসের বিশুদ্ধ খাবার আইন, ১৯৬৬ *(The Cantonment's Pure Food Act, 1966)*

৪। অমানবিক পাচার দমন আইন, ১৯৩৩ *(Suppression of Immoral Traffic Act, 1933)*

৫। কারা আইন, ১৮৮৪ (*The Prison Act, 1884)*

৬। কিশোর অপরাধ সংশোধন স্কুল আইন, ১৯২৮ *(The Borstal Schools Act, 1928)*

৭। শিশু বিধি, ১৯৭৬ (*Children Rules, 1976)* এবং

৮। ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৮৯৮ *(The Code of Criminal Procedure, 1898) :* (শারীরিক শাস্তির পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে)।

এই আইনগুলোতে কতিপয় অপরাধের জন্য শারীরিক শাস্তি হিসাবে চাবুক মারা ও বেত্রাঘাতের বিধান রয়েছে, যেমন চাবুক আইনের ৩,৪ ও ৫ ধারায় দন্ডবিধি,১৮৬০ এর ৩৭৮, ৩৮০, ৩৮২, ৪৪৩, ৪৪৫, ৩৬০, ৩৬১, ৩৬২, ৩৭৫, ৩৭৭, ৩৯০, ৩৯১, ৫০৯, ৩৬৬ (এ), ৩৬৬ (বি) ও ৩৬৭ ধারায় সংজ্ঞায়িত চুরি, অনধিকার গৃহ প্রবেশ, গৃহ ভাংচুর, অপহরণ, ডাকাতি, মানহানি ইত্যাদি অপরাধের জন্য দন্ডবিধিতে উল্লিখিত শাস্তির পরিবর্তে বা উক্ত শাস্তির অতিরিক্ত হিসাবে শারীরিক শাস্তি প্রদানের বিধান রয়েছে। অনুরূপভাবে উল্লিখিত অন্যান্য আইনগুলোতেও চাবুক দ্বারা বা বেত্রাঘাতের দ্বারা শাস্তির বিধান রয়েছে। অন্যদিকে ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৯০ থেকে ৩৯৪ ধারায় চাবুক দ্বারা শাস্তি প্রদানের পদ্ধতি কি হবে তার বিধান করা হয়েছে।

লক্ষ্যণীয় যে চাবুক আইন ও সেনানিবাসের বিশুদ্ধ খাবার আইন দু'টিতে পুরুষ, নারী ও শিশু অপরাধী সকলের ক্ষেত্রেই চাবুক দ্বারা শাস্তি প্রদানের বিধান রয়েছে। অপরদিকে অমানবিক পাচার দমন আইন ও কারা আইন দু'টিতে শুধুমাত্র পুরুষ ও শিশু অপরাধীর ক্ষেত্রে চাবুক মারার বিধান রয়েছে। শুধুমাত্র শিশু অপরাধীর ক্ষেত্রে চাবুক দ্বারা শাস্তি প্রদানের বিধান রয়েছে কিশোর অপরাধ সংশোধন স্কুল আইন, শিশু আইন এবং রেলওয়ে আইনে। দেখা যাচ্ছে শারীরিক শাস্তি সংক্রান্ত আইনগুলো শিশু এবং নারী অপরাধীদের ক্ষেত্রেও প্রয়োগযোগ্য। কিন্তু নারী ও শিশুদের ক্ষেত্রে এরূপ শারীরিক শাস্তি প্রদান দেশের সুষ্ঠু আইন ও বিচার প্রয়োগ ব্যবস্থার প্রতি একটি নেতিবাচক ভাবমূর্তি তুলে ধরছে। অপরদিকে বাংলাদেশ দন্ডবিধির ৮৯ ধারায় বলা হয়েছে যে, ১২ বছরের নীচের শিশুদের কল্যাণের জন্য তাদের আইনগত অভিভাবকগণ যদি সরল বিশ্বাসে কোন কাজ করে যা থেকে তাদের কোন ক্ষতির সম্ভাবনা থাকতে পারে, তাহলে এরূপ কাজকে অপরাধ হিসাবে গণ্য করা হবে না। এই ধারাটি তাই শিশুদের কল্যাণের জন্য তাদের অভিভাবক কর্তৃক শারীরিক শাস্তি প্রদানের পথ উন্মুক্ত রাখে এবং অনেকটাই আইনগত সমর্থন প্রাপ্ত হয়। এছাড়াও আমাদের দেশে বেত্রাঘাত মাঝে মধ্যে শারীরিক শাস্তি হিসাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রয়োগ করা হয়। পুলিশের হেফাজতে, কারাগারে, কোন কোন প্রতিষ্ঠানে, গৃহে ও অন্যান্য স্থানেও শিশুদের উপর শারীরিক নির্যাতনের নজির রয়েছে যা অগ্রহনযোগ্য। আবার বাংলাদেশে ফতোয়ার মাধ্যমে দোররা দ্বারা অবৈধভাবে শাস্তি প্রদান করা হচ্ছে যার শিকার মূলতঃ নারী সমাজ। এধরনের শাস্তি প্রদান বেআইনী ও অগ্রহনযোগ্য ।

শারীরিক শাস্তি প্রদান একটি প্রাচীন এবং পরিত্যক্ত পদ্ধতি। এটি কষ্টদায়ক এবং মর্যাদাহানিকর এবং এর উদ্দেশ্য একটি আধুনিক রাষ্ট্রের সফল আইন প্রয়োগ ও বিচার ব্যবস্থার পরিপন্থী। কেননা এটি একটি প্রতিশোধমূলক শাস্তি পদ্ধতি, সংশোধনমূলক নয়। কিন্তু আধুনিক রাষ্ট্রসমূহ শাস্তির ক্ষেত্রে সংশোধনমূলক শাস্তি পদ্ধতিকেই বেশি গ্রহণযোগ্য মনে করে। বিশেষ করে শিশু অপরাধীদের ক্ষেত্রে যেখানে তাদের সংশোধনকে বেশি গুরুত্ব প্রদান করা উচিত সেক্ষেত্রে শারীরিক শাস্তি প্রয়োগ অত্যন্ত নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। এটি শিশুদের শারীরিক ও মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করে ফেলতে পারে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শারীরিক শাস্তি প্রয়োগ শিশুদের বিদ্যালয় হতে ঝরে পড়ার একটি বড় কারণ। শারীরিক শাস্তির কারণে শিশুদের মধ্যে হতাশা, আশ্রয়হীনতা, মাদকাসক্তি, আক্রমনাত্মক আচরণের প্রবণতা বৃদ্ধি পায়।

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন অনুসারে প্রত্যেক ব্যক্তির আত্মসম্মান ও শারীরিক ক্ষতি হতে রক্ষা পাওয়ার অধিকার আছে যা সকল মানুষকে নির্যাতন, নৃশংসতা, অমানবিক বা অসম্মানজনক ব্যবস্থা হতে রক্ষা করে। বাংলাদেশ সংবিধানের ৩৫ (৫) অনুচ্ছেদ অনুসারে "কোন ব্যক্তিকে যন্ত্রণা দেওয়া যাইবে না কিংবা নিষ্ঠুর, অমানবিক বা লাঞ্ছনাকর দন্ড দেওয়া যাইবে না কিংবা কাহারো সহিত অনুরূপ ব্যবহার করা যাইবে না"। বাংলাদেশ The United Nations Convention Against Torture and Other Cruel Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, 1984 এবং International Covenant on Civil and Political Rights, 1966-এ স্বাক্ষর প্রদান করেছে। শেষোক্ত সনদের ৭ অনুচ্ছেদে কারো প্রতি নির্যাতন, নৃশংস, অমানবিক বা অসম্মানজনক আচরণ করাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশ The United Nations Convention on the Rights of the Child, 1989 স্বাক্ষর করেছে। উক্ত সনদের ৩৭(১) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে "কোন শিশুই নির্যাতন কিংবা কোন প্রকার নির্দয়, অমানবিক বা অসম্মানজনক আচরণ বা শাস্তির শিকার হবে না।" এছাড়াও উক্ত সনদের ৩(১), ১৯(১), ৩৭(২) ও ৩৭(৩) অনুচ্ছেদে শিশুদের প্রতি শারীরিক শাস্তির বিরোধিতা করা হয়েছে। এসব আন্তর্জাতিক সনদে স্বাক্ষর করা এটাই প্রমাণ করে যে বাংলাদেশ শারীরিক শাস্তি প্রয়োগকে নীতিগতভাবে সমর্থন করে না।

বাংলাদেশে উচ্চ আদালতসমূহও বিভিন্ন সময়ে শারীরিক শাস্তির বিরুদ্ধে রায় প্রদান করেছেন। বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট) এবং আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) এর পক্ষ হতে গত ১৮ জুলাই ২০১০ খ্রিঃ তারিখে সংবিধানের ৪৪ ও ১০২ অনুচ্ছেদ বলে একটি রিট পিটিশন দায়ের করা হয়

(রিট পিটিশন নং ৫৬৮৪/২০১০) যার পরিপ্রেক্ষিতে সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ গত ১৩ জানুয়ারী ২০১১ খ্রিঃ তারিখে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সব ধরনের শারীরিক শাস্তি প্রদান অসাংবিধানিক ও মানবাধিকারের লংঘন ঘোষণা করে রায় প্রদান করে। এরই ভিত্তিতে গত ৯ই আগষ্ট, ২০১০ খ্রিঃ তারিখে শিক্ষা মন্ত্রণালয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে শারীরিক শাস্তি বন্ধ ঘোষণা করে একটি পরিপত্র জারী করেছে। তাছাড়া ২০১১ খ্রিঃ এর এপ্রিলে মন্ত্রীপরিষদ কর্তৃক নতুন শিশু আইন এর খসড়া গৃহীত হয়েছে যার ৭৯ (৪) ধারায় শিশুদের প্রতি সকল প্রকার শারীরিক শাস্তি নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। এই আইনে শিশু হিসাবে বয়স সীমা ১৮ বছরে বর্ধিত করা হয়েছে যা পূর্বে ১৬ বছর ছিল।

বাংলাদেশ সংবিধান, বাংলাদেশ কর্তৃক স্বাক্ষরিত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সনদ এবং দেশের উচ্চ আদালতের রায় ইত্যাদি দিক থেকে প্রতীয়মান হয় বাংলাদেশ বর্তমানে নারী, পুরুষ ও শিশু তথা সকলের জন্যই সব ধরনের শারীরিক শাস্তি সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ ঘোষণা করার একটি নীতিগত বাধ্যবাধকতায় উপনীত হয়েছে। বিশেষতঃ এই রিপোর্টে উল্লিখিত আইনসমূহ বিশেষভাবে শিশু বা কিশোর অপরাধীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিধায় এ সকল আইন বাতিল বা সংশোধন করা এখন অতীব জরুরী। অবশ্য বাস্তব ক্ষেত্রে অর্থ্যাৎ বিচার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শাস্তি হিসাবে এ সকল আইনের প্রয়োগ একেবারে নেই বললেই চলে। কিন্তু দেশের আইন ব্যবস্থায় এ ধরনের আইন বিদ্যমান থাকায় তা আমাদের দেশের আইন ও বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা সৃষ্টি করে। তাছাড়া আমাদের দন্ডবিধি হতে ১৯৪৯ সালেই সংশোধনীর মাধ্যমে 'চাবুক মারা' কে এর ৫৩ ধারায় বর্ণিত শাস্তির তালিকা হতে বিলুপ্ত করা হয়েছে। এমতাবস্থায় দন্ডবিধি বহির্ভূত অপর কোন আইন দ্বারা শারীরিক শাস্তির বিধান রাখা মূল আইনের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ।

উপরোক্ত প্রেক্ষাপটে আইন কমিশন বাংলাদেশে শারীরিক শাস্তি বাতিল প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত সুপারিশসমূহ প্রদান করছে ঃ

১। চাবুক আইন, ১৯০৯ সম্পূর্ণরূপে বাতিল করা হোক।

২। রেলওয়ে আইন, ১৮৯০, সেনানিবাসের বিশুদ্ধ খাবার আইন, ১৯৬৬, অমানবিক পাচার দমন আইন, ১৯৩৩, কারা আইন, ১৮৮৪, কিশোর অপরাধ সংশোধন স্কুল আইন, ১৯২৮, শিশু বিধি, ১৯৭৬ এ উল্লিখিত শারীরিক শাস্তি সংক্রান্ত ধারাসমূহ সংশোধন করা হোক এবং সেখানে বিকল্প শাস্তির বিধান করা হোক।

৩। দন্ডবিধির ৮৯ ধারা হতে শারীরিক শাস্তি প্রয়োগের সুযোগ নিষিদ্ধ করে ধারাটি সংশোধন করা হোক।

৪। ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৯০ ধারা হতে ৩৯৪ ধারা পর্যন্ত বাতিল করা হোক।

৫। ফৌজদারী কার্যবিধির ৩২ ধারায় ম্যাজিস্ট্রেটের শাস্তি প্রদানের ক্ষমতাসমূহের মধ্য হতে 'চাবুক মারা' কে বাতিল করা হোক।

৬। শিশু আইনের খসড়াটিতে যত শীঘ্র সম্ভব আইনের রূপ প্রদান করা হোক।

৭। শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক ৯ই আগষ্ট, ২০১০ সালের ঘোষিত শারীরিক শাস্তি নিষিদ্ধকরণ সংক্রান্ত পরিপত্রটিকে আইনে রূপান্তরিত করা হোক।

৮। নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ অথবা পেনাল কোড, ১৮৬০ এ সংশোধনীর মাধ্যমে ফতোয়া অথবা সালিশ দ্বারা শারীরিক নির্যাতন নিষিদ্ধ ও শাস্তিযোগ্য করে বিধান প্রণয়ন করা হোক।

এই আইনগুলোর সংশোধন বা বাতিল সংক্রান্ত সংশোধনী যে কোন একটি আইন প্রণয়নের মাধ্যমে করা যেতে পারে অথবা ভিন্ন ভিন্ন সংশোধনীও আনা যেতে পারে।

(অধ্যাপক ড. এম. শাহ আলম)
চেয়ারম্যান (ভারপ্রাপ্ত)
আইন কমিশন